85102 - কাউকে কাফের বলার মূলনীতিসমূহ

প্রশ্ন

যে সমস্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের কিংবা মুনাফিক হুকুম দেয়া যায় সেগুলো অনুগ্রহ করে জানাবেন; যাতে করে আমি এমন কোনো বিদআতে লিপ্ত না হই যাতে বহু দল জড়িয়ে পড়েছে। আর আমাকে এ বিষয়ে কোন কিতাব পড়ার পরামর্শ দিবেন? উল্লেখ্য আমি একজন প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবুল ইলম।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

কাফের বা ফাসেক হুকুম দেয়ার মূলনীতিসমূহ:

সংশ্লিষ্ট কথা বা কাজ যে কাফের হওয়া বা ফাসেক হওয়াকে আবশ্যক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা। কাফের হওয়া বা ফাসেক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া ও প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বিধানটি নির্দিষ্ট সেই বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কাফের ও ফাসেক হুকুম প্রদান: কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতি

কাফের ও ফাসেক হুকুম প্রদান আমাদের হাতে নয়। বরং এর উৎস আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যার উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কুরআন ও সুন্নাহ যার কাফের বা ফাসেক হওয়া প্রমাণ করে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফের বা ফাসেক হুকুম দেওয়া যাবে না।

মুসলিমকে কাফের হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতার ভয়াবহতা ও পরিণতি:

বাহ্যতঃ দ্বীনদারিতা প্রকাশমান মুসলিমের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে তার ইসলাম অটুট থাকা ও দ্বীনদারিতা বজায় থাকা; যতক্ষণ না কোনো শরয়ি দলীলের মাধ্যমে তার এই অবস্থা দূর হওয়া সাব্যস্ত হয়। এমন মুসলিমকে কাফের বা ফাসেক

হুকুম প্রদান করার ক্ষেত্রে শিথিলতা করা জায়েয নয়। কারণ এমন শিথিলতায় জঘন্য দুইটি অনিষ্ট রয়েছে:

এক: এই হুকুমের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা এবং হুকুমটি যে ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে বিশেষিত করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা।

দুই: মুসলিম ভাইয়ের উপর অপবাদ আরোপে লিপ্ত হওয়া; যদি সে এর থেকে মুক্ত হয়।

সহিহ বুখারী (৬১০৪) ও মুসলিম (৬০) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ব্যক্তি যদি তার ভাইকে কাফের বলে তাহলে তাদের দুজনের মাঝে একজন কুফরীর শিকার হয়।” অন্য বর্ণনায়: “সে যাকে কাফের বলছে সে যদি কাফের হয় তাহলে তো হলোই; নতুবা বক্তার উপরই সেটি ফিরে আসবে।”

কাফের বা ফাসেক হুকুম দেয়ার মূলনীতিসমূহ:

এক: সংশ্লিষ্ট কথা বা কাজ যে কাফের হওয়া বা ফাসেক হওয়াকে আবশ্যক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা।

দুই: কাফের হওয়া বা ফাসেক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া ও প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বিধানটি নির্দিষ্ট সেই বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

কাফের হুকুম দেয়ার শর্তাবলি

কাফের হুকুম দেয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে:

ইসলাম-বিরোধী যে কথা বা কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাফের হওয়া বা ফাসেক হওয়াকে আবশ্যক করছে সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

“সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পর কেউ যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরতে চেয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করব। সেটা কতই না খারাপ গন্তব্য!”[সূরা নিসা: ১১৫]

তিনি আরো বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"কোনো সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর পর তারা কি কি পরিহার করবে তা স্পষ্ট বলে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে বিপথগামী করেন না। আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে জানেন।"[সূরা তাওবাহ: ১১৫]

তাই আলেমেরা বলেছেন: ফরয অস্বীকারকারী ব্যক্তি যদি নতুন ইসলামগ্রহণকারী হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ না তার কাছে শরয়ি বিধান স্পষ্ট করা হবে, ততক্ষণ তাকে কাফের বলা করা হবে না।

কাফের বা ফাসেক হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে কুফরী বা ফুসুকী আবশ্যক হয় এমন কিছু তার পক্ষ থেকে তার অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া। এর বিবিধ রূপ রয়েছে, যথা:

১. সেটি করতে তাকে বাধ্য করা। জবরদস্তির শিকার হয়ে সে সেটি করা; স্বাচ্ছন্দে নয়। এমতাবস্থায় তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"(তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে) যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তবে তারা ব্যতীত যাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় (অর্থাৎ যাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়) অথচ ঈমানে তাদের মন প্রশান্ত; বরং যারা কুফরীতে মন খুলে দেয় (অর্থাৎ মন থেকেই কুফরী করে), তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ। এদের জন্য ভয়ানক শাস্তিও রয়েছে।"[সূরা নাহল: ১০৬]

- তার চিন্তা করার শক্তি স্থবির হয়ে পড়লে। তীব্র আনন্দ, প্রচণ্ড দুঃখ বা ভীতি কিংবা অনুরূপ কারণে সে কী বলছে তা নিজে না জানা।

এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সহিহ মুসলিমে (২৭৪৪) বর্ণিত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয় সব বাহনের পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস; আর আমি তোমার প্রভু!' সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে ফেলে।"

২. আরো একটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে ব্যক্তি কোনো তা'বীল (অপব্যাখ্যা)-র দ্বারা প্রভাবিত হওয়া: অর্থাৎ সে কিছু সংশয়কে আঁকড়ে ধরা এবং সেগুলোকে প্রকৃত দলীল মনে করা। কিংবা সে শরয়ি দলীলকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারা। তাই ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা যাবে না যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাবে যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে (সত্যের) বিরোধিতা করছে এবং তার অজ্ঞতা দূর হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

"এ ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা (পাপ হবে); তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা আহযাব: ৫]

ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৩/৩৪৯) গ্রন্থে বলেন: 'ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সমস্ত খলীফাদের (যারা জাহমীদের আকীদায় প্রভাবিত হয়ে কুরআনকে সৃষ্ট দাবি করেছিল এবং এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছিল) জন্য রহমতের দোয়া করেছিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়নি যে, তারা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে অস্বীকারকারী। কিন্তু তারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছেন এবং যারা এমন মতামত দিয়েছিল তাদের তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) করেছে।'[সমাপ্ত]

তিনি আরো বলেন [মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/১৮০)]:

"তাকফীর করার ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করেছে ও সত্য অন্বেষণ করতে গিয়ে ভুল করেছে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং তার ভুল ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তির কাছে রাসূল যা নিয়ে এসেছে তা স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করেছে এবং সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করেছে সে কাফের। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, সত্য অন্বেষণে অবহেলা করেছে এবং না-জেনে কথা বলেছে সে অবাধ্য ও পাপী। অতঃপর সে ফাসেক হতে পারে, আবার তার এমন কিছু ভালো কাজ থাকতে পারে যা মন্দ কাজের চেয়ে বেশি হতে পারে।"[সমাপ্ত]

তিনি আরো বলেন (৩/২২৯):

"যে ব্যক্তি আমার সাথে উঠাবসা করে সে জানে যে আমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নিষেধ করে থাকি; যদি না এটি জানা যায় যে তার উপর রিসালাতের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে যেটির বিরোধিতা করলে ব্যক্তি কখনো কাফের, কখনো ফাসেক আবার কখনো অবাধ্য হয়ে যাবে। আমি স্বীকৃতি দিই যে, আল্লাহ এই উম্মতের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ক্ষমা সংবাদমূলক বাচনিক ভুলসমূহ ও কর্মগত

ভুলসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধরনের বহু বিষয়ে সালাফ মতভেদ করে আসছেন। কিন্তু তাদের কেউ একে অন্যকে কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেনি।’

তিনি কিছু উদাহরণ দিয়ে এরপর বলেন:

‘আমি স্পষ্ট করেছি যে সালাফ ও ইমামদের পক্ষ থেকে ‘অমুক অমুক কথা যে বলে সে কাফের' এমন উদ্ধৃতিও সত্য। তবে কাউকে নির্দিষ্ট না করে বলা আর নির্দিষ্ট করে বলার মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক...’

এক পর্যায়ে তিনি বলেন: ‘তাকফীর করা শাস্তির হুমকি প্রদানের মতো। যদিও কোন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হয়, কিন্তু হতে পারে সেই ব্যক্তি সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা সুদূর মরু অঞ্চলে সে বেড়ে উঠেছে। এমন ব্যক্তি যা অস্বীকার করেছে সেটির দায়ে তাকে কাফের বলে গণ্য করা যাবে না; যতক্ষণ না তার কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। হতে পারে ঐ ব্যক্তি শরীয়তের সেই দলিলগুলো শোনেনি কিংবা শুনলেও তার কাছে সেগুলো সাব্যস্ত হয়নি কিংবা তার কাছে সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য দলিল আছে যা সেই দলিলগুলোর তা'বীল (ব্যাখ্যা) করাকে অনিবার্য করে; যদিও তার তা'বীল ভুল হয়।

আমি সবসময় সহিহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করি। এক লোক বলেছিল: ‘যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে পুড়াবে, এরপর গুঁড়ো করে ফেলবে। তারপর আমাকে সাগরে ছড়িয়ে দিবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে পেয়ে যান তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে দেননি।’ তার সন্তানেরা তার সাথে সেটাই করল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তোমাকে কোন বিষয়টি এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?’ লোকটি বলল: ‘আপনার প্রতি ভয়’। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এই ব্যক্তি এমন লোক যে আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে এবং তাকে ছিটিয়ে দেয়ার পর পুনরুত্থান করার ব্যাপারে সে সন্দেহ পোষণ করেছিল। বরং সে বিশ্বাস করেছিল যে তাকে পুনরুত্থিত করা যাবে না। মুসলিমদের সর্বসম্মতক্রমে এমন বিশ্বাস কুফরী। কিন্তু সে ছিল অজ্ঞ। এই বিষয়টি তার জানা ছিল না। কিন্তু, সে মুমিন ছিল এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করত। সে জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সুতরাং ইজতিহাদ করার যোগ্য, রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সচেষ্ট তা'বীলকারী (ভুল ব্যাখ্যাকারী) এই ব্যক্তির চেয়ে ক্ষমা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।’[সমাপ্ত]

[শাইখ ইবনে উছাইমীনের ‘আল-কাওয়ায়েদুল মুছলা’ গ্রন্থের উপসংহার থেকে সংকলিত ও কিছু বিষয় সংযোজিত]

তাকফীরের বিষয়টি যেহেতু এতটা ভয়াবহ এবং এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়াটা গুরুতর তাই একজন ত্বালেবুল ইলমের, বিশেষে করে প্রাথমিক স্তরের তালেবুল ইলমের উচিত এ বিষয়ে কথা না বলা এবং নিজেকে এমন উপকারী ইলম অর্জনে ব্যস্ত রাখা যার

মাধ্যমে সে নিজের দুনিয়া-আখিরাতকে সংশোধন করতে পারবে।

আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার গুরুত্ব

আপনাকে কিছু বই পড়ার পরামর্শ দেওয়ার আগে আমরা আপনাকে উপদেশ দিব যেন আপনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর আলেমদের সাহায্য নেন। কারণ এটি অধিকতর সহজ ও নিরাপদ পথ। তবে শর্ত হচ্ছে আপনি যার থেকে ইলম নিবেন তিনি জ্ঞানে ও দ্বীনদারিতায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে, সুন্নাহর অনুসরণে ও বিদআত পরিহারে বিশ্বস্ত হতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘নিশ্চয় এই ইলম দ্বীন। সুতরাং আপনারা যাচাই করে দেখুন কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছেন।’[মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থের ভূমিকায় উক্তিটি বর্ণনা করেছেন]

আপনি যে স্থানে আছেন সেখান থেকে যদি আপনার জন্য আলেমদের দরসে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহলে তাদের লেকচারের ক্যাসেটের সাহায্য নিতে পারেন। বর্তমানে সিডি বা ইসলামী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেগুলো পাওয়া আরও সহজ হয়ে গিয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আপনি কিছু ত্বালিবে ইলমের দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন, যারা শরয়ি জ্ঞান ও সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে আগ্রহী। খুব কম স্থানই আছে যেখানে এ ধরনের ত্বালিবে ইলম নেই; ইন শা আল্লাহ।

প্রস্তাবিত কিছু বই:

আপনি যে কিতাবগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারেন:

- তাফসীর: শাইখ ইবনে সা'দীর রচিত 'তাফসীরে সা'দী' এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর।
- হাদীস: 'আল-আরবাউন নাওয়ায়িয়াহ' (ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস) এবং সাথে এর যে কোনো একটি ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা হিসেবে ইবনে রজবের ‘জামেউল উলূমি ওয়াল-হিকাম’ বইটিকে গুরুত্ব দিবেন। এরপর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ বইটি নিতে পারেন এবং এই বরকতময় বইটিকে বেশি গুরুত্ব দিবেন। আপনি এ বইটির ক্ষেত্রে শাইখ ইবনে উছাইমীনের ব্যাখার সহায়তা নিতে পারেন।
- আকীদা: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ‘কিতাবুত তাওহীদ’ -কে গুরুত্ব দিবেন। বইটির সাথে এরই একটি সহজ ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়বেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার ‘আল-আকীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ’ পড়বেন। সাথে এ বিষয়ে কিছু উপকারী পুস্তিকা পড়বেন। যেমন: ইবনে রজবের ‘তাহকীকু কালিমাতিল ইখলাস’ এবং ইবনে তাইমিয়্যার ‘আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যা ফিল-আ’মাল আল-ক্বালবিয়্যাহ’।
- ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহুর ‘যাদুল মা’আদ’ গ্রন্থের সহায়তা নিবেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য অনেক বই, যেমন: 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব', 'আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া'।

এটি একটি প্রাথমিক তালিকা। পড়ার সাথে সাথে যদি আপনি এমন কাউকে পেয়ে যান যে আপনাকে পড়তে ও বুঝতে সাহায্য করবে তাহলে আপনার জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বই জানার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপনার ইলম বৃদ্ধি পাবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।